OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 737 - 744
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার পিঠাপুলি : বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নান্দনিকতার প্রতীক

মৌসুমী হালদার
Email ID: sudiptomou1998@gmail.com
0009-0005-0462-718X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Pithapuli, Cultural heritage, Poush Sankranti, Bengali Cuisine, Diversity, Food aesthetics, Bengali tradition, Family bonding, social cohesion.

Abstract

Pithapuli (various forms of traditional Bengali rice cakes, steamed or fried) represents a significant yet under researched intangible cultural heritage of Bengal, deeply Interwined with the region's agricultural cycle, seasonal changes and social fabric. This research explores pithapuli as a profound symbol of Bengali identity, Analyzing it through the lenses of diversity, cultural heritage and aesthetics. Primarily prepared during the winter harvest festival of 'Poush Sankranti', pithapuli showcases remarkable variations in shape, texture and taste, ranging from steamed bhapa pitha and spongy chitoi to the rolled crepe of patishapta and intricate nakshi pithe.

This study identifies the communal preparation of these sweets as a practice that fosters family bonding and hospitality, reinforcing social cohesion and continuity of tradition across generations. Furthermore, the study delves into the aesthetic dimensions of pithapuli, where the meticulous shaping of rice flour and coconut dough is regarded as a form of folk art, often reflecting rural craftsmanship and aesthetic sensibility.

Pithapuli holds a significant place in Bengali literature, notably in the Mangal Kavya, symbolizing an agrarian lifestyle and cultural identity. The research examine how pithapuli acts as a bridge between the rural and urban divide. While rooted in village tradition, the 'Pitha – Utsavs' (festivals) in metropolitan areas demonstrate the resilience of this heritage in the face of globalization.

This research highlights the need to preserve this delicate, time intensive and culturally rich culinary art against the backdrop of modernization and fast – food trends, arguing for its recognition as a vital, living component of West Bengal's aesthetic legacy. The abstract concludes that pithapuli is a vital component of Bengali identity, embodying a shared history that transcends political borders and celebrates the region's pluralistic spirit.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

আমাদের বাংলায় ঋতু হল ছয়টি। আর এই ছয়টি ঋতুর একটি হল শীত। শীতের সাথে উৎসবের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শীত পড়তে শুরু করলেই বাংলার শহর – গ্রাম সব জায়গাতেই উৎসবের ধুম পড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ হলো এ সময় গ্রামের ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। আর সেই ধান দিয়ে হয় উৎসব। শীতের উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হল পিঠাপুলি। পিঠা ছাড়া শীতের উৎসবের আনন্দই যেন হয় না। ঘরে ঘরে তখন চালের গুঁড়া, গুড়, নারকেল, দুধ, খেজুরের রসে ভরে যায়। আর এইসব দিয়ে নানান বাহারি পিঠা তৈরি হয়। মূলত যেসব খাবার চালের গুঁড়া এবং গুড় সহযোগে বানানো হয় সেগুলোকেই পিঠা বলে। অনেক সময় এর সাথে নারকেল যোগ করা হয় এবং ভাজার জন্য তেল। কিছু পিঠায় সবজিও ব্যবহার করা হয় যেমন – সবজি পুলি। তবে বর্তমানে ময়দা ও চিনি দিয়েও পিঠা তৈরি করা হচ্ছে। আর রসের পিঠাগুলোতে খেজুরের রস ও দুধের ব্যবহার পিঠার স্বাদ আরো বহুগুন বাড়িয়ে দেয়। সারাবছরই নানা উৎসবে পিঠাপুলি খাই আমরা। পয়লা বৈশাখে নকশি পিঠা, গ্রীষ্মকালে তালের পিঠা। গ্রামবাংলায় আসলে পিঠার মৌসুম শুরু হয় হেমন্তের নবান্ন উৎসবে। কারণ এই সময় কৃষক তার ঘরে ধান তোলে। সে আনন্দে নতুন ধানের পিঠা উৎসব শুরু হয় গ্রামে গ্রামে। শীত এলে তাই গ্রাম থেকে শহর অবধি শুরু হয়ে যায় পিঠা বানানো আর পিঠা খাওয়ার ধুম। পিঠা শুধু খেতেই মজা নয় বরং পিঠার নামগুলোও অনেক মজার।

আজ থেকে প্রায় দু–আড়াই হাজার বছর আগের কথা, তখন বাঙালির হেঁশেলে ছিল শিল-নোড়া আর মাটির উনুন। তাই তখন নতুন চাল শিলনোড়া দিয়ে পিষে চাল গুঁড়ো করা হত এবং পিঠা তৈরি হত উনুনে। সংস্কৃত ভাষায় কোনো শস্য বা দানা পিষে যা তৈরি হত, তাকে বলা হত ‘পিষ্ট’। আর চাল বা ডাল পিষে অর্থাৎ ‘পিটুলি’ তৈরি করে তা দিয়ে যে বিশেষ খাবার বানানো হত, সংস্কৃত পন্ডিতরা তার নাম দিয়েছিলেন ‘পিষ্টক’। পিঠার ইতিহাস যে হাজার হাজার বছরের পুরোনো তার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের বৈদিক সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথিপত্র খুব একটা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগ থেকে পাওয়া যায়, সেই সময়ের এমন কোনো সাহিত্য পাওয়া যায় না, যেখানে মিষ্টির উল্লেখ আছে কিন্তু পিঠার উল্লেখ নেই। বাংলার কাব্যসাহিত্য, মহাকাব্যিক আখ্যান থেকে লোকায়ত সাহিত্য সুবাসিত হয় পিঠার ঘ্রাণে। কৃত্তিবাস ওঝার ‘শ্রীরাম পাঁচালীতে’ বলা হয়েছে —

“শেষে অম্বলান্তে হইল ব্যঞ্জন সমাপ্ত,
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।”[১]

বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণে’ আমরা দেখতে পাই, চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকার খাবারের যে বিবরণ দিয়েছেন কবি, তাতে বলেছেন, -

“খির খিরাইরা রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ পিঠা,
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা।”[২]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ‘চন্ডীমঙ্গলে’ নানা ধরনের পিঠার কথা বলেছেন, -

“কলা বড়া, মুগ সাউদি, ক্ষীর মোন্না, ক্ষীর পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।”[৩]

শ্রীচৈতন্যদেব পিঠে খেতে খুব ভালোবাসতেন তার পরিচয় আমরা পাই, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে সেখানে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্য রান্নার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, -

“ক্ষীর পুলি, নারিকেল পুলি আর পিষ্ঠ
কাঞ্জি বড়া, দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি
আর যত পিঠা কইল কহিতে না সকি।”[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী পদ্মমুখী ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য রেঁধে ছিলেন রকমারি পিঠে।

"অম্বল রাঁধিয়া রামা, আরম্ভিলা পিঠা,
বড়া এল আশিকা পীযূষী পুরি পুলি
চুষি রুটি রামারোট মুগের সামুলী।"[৫]

'ঠাকুমার ঝুলি'-তে কাঁকনমালা আর কাঞ্চনমালার গল্পে কে রানি আর কে দাসী, তাঁর মীমাংসা হয়েছিল পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে দু'জনের মুনশিয়ানা দেখে। দাসী বানিয়েছিল আস্কে পিঠা, ঘাস্কে পিঠা আর রানি সরুচাকলি, চন্দ্রপুলি, আরও কত কি।[৬]

এছাড়াও মহাভারতে প্রায় ১০৮ রকমের পিঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের উওরাকান্ড থেকে জানা যায়, সীতা লক্ষ্মণকে নিজের হাতে নানা পিঠাপুলি রান্না করে আহার করিয়েছিলেন। এমনকি প্রভু জগন্নাথ দেবের ভোগেও নানান খাবারের মধ্যে অন্যতম দুটি পদ হল মাঠপুলি ও পিঠাপুলি।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত পৌষের শীতে পিঠাপুলি না পাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'পৌষ পার্বণ ২' কবিতায়। তিনি লিখেছেন, -

"এবারে বছরকার দিনে, কপালে ভাই,
জুটলো নাকো পুলি পিঠে।
যে মাগগির বাজার, হাজার হাজার,
মর্তেছে লোকে, কপাল পিঠে।"[৭]

ভাষার স্রোত বড় অদ্ভুত। নদী যেমন গতিপথে বাঁক বদলায়, ঠিক তেমনি শব্দও সময়ের গতিপথে রূপ বদলায়। সংস্কৃতের এই গম্ভীর শব্দ 'পিষ্ঠক' সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রাকৃত ভাষায় হয়ে গেল 'পিটঠক' বা 'পিটঠা'। সেখান থেকে আরো খানিক পথ হেঁটে বাংলায় এসে তার নাম হল 'পিঠা'। যাকে আমরা বলি পিঠে। কিন্তু শব্দটি আসলে পিঠা। আসামেও এর নাম 'পিঠা'। ওড়িশায় একে বলে 'পোড় পিঠা'। নাম যাই হোক, মূল মন্ত্র কিন্তু সেই একটাই – শস্য পিষে অমৃত প্রস্তুত করা।

নতুন শস্য ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং তার বয়সও অনেক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য উৎসবের ধারা প্রচলিত হয়েছে সমস্ত দেশে ও সমাজে। সেই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী আমাদের পৌষ সংক্রান্তির পিঠাপুলি উৎসব। এই তিথিতে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পালিত হয়।

'অন্নোৎসব পোঙ্গল'। আসামের মাঘ – বিহু উৎসবের মুখবন্ধ এইদিনেই। গুজরাটে ঐ দিন শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে সূর্য পূজা ও ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করার রেওয়াজ রয়েছে। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে হয় গঙ্গাসাগর মেলা। কপিলমুনির পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তি যাইহোক না কেন – প্রাচীন হিন্দুরা মকর বাহিনী গঙ্গাকে ঐ তিথিতে ভগীরথ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন শিবের জটা থেকে মুক্ত করে এমন কল্পনা করেই পুরাণ বৃত্তান্ত গড়েছিলেন। 'মকর' ভাবানুষঙ্গেই এই ভাবনার উদ্ভব সন্দেহ নেই। এই তারিখে পূর্ব-বাংলায় বাস্তু পূজার যে প্রথা আছে, সেখানে (মকরের বিকল্পে) মাটির কুমির বলি দেবার রীতিও সম্ভবত এই আদিম ভাবনার সূত্রবাহী।

পৌষ সংক্রান্তির বিচিত্র ধরনের উৎসব একদিকে, অন্যদিকে পিঠাপুলির বৈচিত্র্য। পিঠা-পুলি-পায়েস ইত্যাদি অধুনা দুর্লভ খাবারগুলি তৈরি এবং বিতরণও এই পৌষ উৎসবের অঙ্গ। পশ্চিমবাংলায় নানা জায়গায় মকর সংক্রান্তির আগের দিন আমন ধান কেটে – এনে গুছিয়ে পূজা করেন মেয়েরা, যার নাম আওনি – বাঁওনি (আমনী–বাঁধনি)। গ্রাম বাংলায় আর একটি এ ধরনের উৎসব হল পৌষ আগলানো। সর্বত্র আলপনা এঁকে গোবরের নাড়ু আর চালের গুঁড়ো পূজা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে সারারাত সেগুলো বিনিদ্র ভাবে পাহাড়া দেওয়ার প্রথাও বিচিত্র প্রাচীন সংস্কারজাত। দুপুরবেলা কুনকের মধ্যে ধান ও ধানের ছড়া ভরে পূজা করে ধান্য লক্ষ্মীর বন্দনা পূর্ব বাংলার বিরাট অংশ জুড়ে প্রচলিত।

প্রতিবছর পৌষ পার্বণ আসে ও যায়, কিন্তু আগের মতো এই পার্বণ উৎসবে বাঙ্গালীর প্রাণটা তেমন মেতে ও নেচে ওঠে কি? সেই পিঠাপুলি খাওয়ার আমোদ, সেই 'বন্দ মাতা সুরধুনী' গানের লহর, সেই হাসি–ঠাট্টা, ফুলের সাজবেশ আর কী আছে? গঙ্গা স্নানে ভিড় হয় ঠিকই গঙ্গাসাগরে অত্যাধিক যাত্রী যায় ঠিকই, কিন্তু ফুলের মালার লতাপাতার নৌকা সাজিয়ে নাচ–গান করতে করতে ত্রিবেণী স্নানে যাওয়ার ধুম নেই। হাসি গেছে, উল্লাস গেছে, কিন্তু আছে সেকালের বিধি পদ্ধতি। তাই গঙ্গা স্নান হয়, বিশেষতঃ বাড়ীর মহিলারা পুরোনো পদ্ধতি ছাড়তে পারেনি। এছাড়াও বাঙালি কেবল দেবতাকে চেনে, দেবতা ছাড়া তাদের অন্য সম্বল নেই, অন্য ভরসা নেই। দেবতা বিরুপ হলে বাঙালির দুঃখের সীমা থাকে না। পৌষ পার্বণের দিন দেবতার দয়া বোঝা যায়, তাই এই দিন বাঙালি প্রাণ ভরে হাসে, প্রাণ ভরে উল্লাস করে। গ্রাম বাংলায় যারা চাষবাস করে, মা লক্ষ্মীর সেবা করে তারা বাবু সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেও তারা এখনও আউনী–বাউনীর আমোদ ভোলেনি। তারা এইদিন পিঠাপুলি তৈরি করে,খায় এবং দশজনকে ডেকে এনে খাওয়ায়। আসলে বাঙালি হলে যেমন উপবাস করতে শিখতে হয়, তেমনি খেতে ও খাওয়াতেও শিখতে হয়। তবেই তো আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে বাংলার পিঠাপুলি উৎসব। তাই এখনও গঙ্গা স্নানে লোক যায়, এখনও তীর্থ ক্ষেত্রে লোকের ভিড় হয়, এখনও সমাজ শরীরের যেটুকু সজীব আছে, সেটুকু নড়ে চড়ে হাসে খেলে।

বাঙলায় বাঙালি ছাড়াও যেমন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করে, ঠিক তেমনি তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে থাকেন। বিভিন্ন উৎসব তারা বিভিন্ন ভাবে পালন করে আসছে বহু কাল থেকে। যা বাঙালিদের কাছে পৌষ পার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তি নামে পরিচিত, তা উওর–পশ্চিম বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে 'সাকরাত' নামে পরিচিত। এটি তাদের সব উৎসবের শেষ ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই পরবের শেষ দিনগুলোতে তারা মৌ ফুলের মউ ও হাঁড়িয়া খেয়ে টুসু গান ও নৃত্য গীতে সকলে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই দিন সাঁওতাল পরিবারের সব মেয়েরা সকাল থেকে সবাই মিলে নিজের হাতে যত্ন সহকারে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন পিঠাপুলি তৈরি করে। সেই পিঠা তাঁরা প্রথমে তাঁদের সবচেয়ে বড় দেবতা 'মারাংবুরু' কে ভক্তিভরে নিবেদন করে। তারপর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিঠের নৈবেদ্য সাজিয়ে উৎসর্গ করেন। এরপর পিঠের সুবাস ও স্বাদে অবগাহন করেন নিজেরা। এইভাবেই প্রতিবছর সাঁওতাল পরগণার মানুষেরা সাড়ম্বরে পালন করেন 'সাকরাত' বা 'পৌষ পার্বণ'।

পিঠা বাঙালি তথা বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার। ভারতের কিছু কিছু এলাকায় পিঠার প্রচলন থাকলেও এটা বাঙালির নিজস্ব খাবার। প্রায় ১৫০ রকমেরও বেশি পিঠা বানানো হয়ে থাকে। তবে এরমধ্যে ৩০ রকমের পিঠা বেশ জনপ্রিয়। আবার অঞ্চলভেদেও পিঠা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ একেক জায়গায় পিঠা একেক রকম। যেমন – উত্তরবঙ্গের অনেক এলাকায় যে পিঠাকে পাকন পিঠা বলে, সেই পিঠাই অন্যান্য এলাকায় তেল পিঠা নামে পরিচিত। তবে সম্ভবত ভাপা পিঠা সব জায়গায় একই নামেই পরিচিত। অবশ্য অঞ্চলভেদে পিঠার ধরনেরও পার্থক্য রয়েছে। যেমন – তেলে ভাজা পিঠাগুলো দক্ষিণবঙ্গে এবং ভাপা পিঠা উওরবঙ্গে বেশি খেতে দেখা যায়।

পুলি পিঠা : বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী পিঠা হল পুলি পিঠা। একে অনেকে চন্দ্রের অর্থাৎ চাঁদের আকার দিয়ে তৈরি করে, তাই চন্দ্র পুলিও বলা হয়। এর আকৃতিটা দেখতে আধখানা চাঁদের মতো। এই পুলি পিঠাও সারারাত দুধে ভেজানো হয়। আর রাতভর দুধে ভিজিয়ে একেকটা পিঠা হয়ে ওঠে অমৃত। তাই একে দুধ পুলিও বলা হয়। এই পিঠা শহরাঞ্চলে মূলত কলকাতা ও উওর ২৪ পরগণা জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। আরেক ধরনের পুলি পিঠা আছে যা 'সবজি পুলি' হিসাবে পরিচিত। এর ভিতরে পুর হিসেবে নারকেল আর গুড় না দিয়ে শীতকালীন সবজি দেওয়া হয়।

চিতই পিঠা/ আস্কে পিঠা : এ পিঠাটি একেক অঞ্চলে একেক গড়েন বানানো হয়ে থাকে। চালের গুঁড়া জলে গুলিয়ে মাটির হাঁড়িতে ছেড়ে দিলেই তৈরি হয়ে যায় চিতই পিঠা বা আস্কে পিঠা। এই পিঠার আরেকটি নাম আছে তা হল 'সড়া পিঠা'। কারণ বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় মাটির সড়ায় এই পিঠা তৈরি করা হয়, তাই এর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাম হয় সড়া পিঠা। সাদাসিধে এই পিঠা গুড় কিংবা ঝাল চাটনি সহযোগে খাওয়া যায়। চুলা থেকে সদ্য নামানো গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চিতই পিঠার স্বাদ অসাধারণ। আবার সারারাত এই পিঠাগুলোকে রসে ডুবিয়ে রাখলে পিঠা ফুলে রসে টসটসে হয়ে যায়। শীতের সকালে এ পিঠার এক টুকরো মুখে ভরলেই মুখ মিষ্টি রসে ভরে যায়। কী যে দারুন এর স্বাদ না খেলে বোঝানো যাবে না।

পাটিসাপটা : গুড় দিয়ে তৈরি হালকা বাদামি অথবা চিনির সাদা পাটিসাপটা আরেক সুস্বাদু পিঠা। এই পিঠা বিশেষভাবে জনপ্রিয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলে, কিন্তু বর্তমানে গোটা বাংলা জুড়ে এই পিঠা খুবই প্রচলিত। গ্রাম থেকে শহর পাটিসাপটা কেবল শীতকালেই নয়, আজকাল সারাবছরই বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু শীতকালে নতুন চালের গুঁড়া, দুধ, নারকেলের পুর দিয়ে বানানো পাটিসাপটা পিঠার স্বাদ আর মজাটাই আলাদা।

বিক্কই পিঠা : এই পিঠা উওরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ প্রচলিত। মূলত গ্রামগুলোতে এধরনের পিঠা বানানো হয়ে থাকে। এ পিঠা বানানো খুব মজার। সাধারণত পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে শুধু নিচেই আগুন দেওয়া হয়, কিন্তু এ পিঠা বানানোর সময় উপর-নীচে দুই দিকেই আগুন দেওয়া হয়। আকারে-আকৃতিতে এই পিঠা অনেকটা কেকের মতো দেখতে।

তেল পিঠা : এই তেল পিঠা দক্ষিণবঙ্গের হাওয়া ও হুগলি জেলায় বেশ বিখ্যাত। এই পিঠা বানানোর পদ্ধতি খুবই সহজ। চালের গুঁড়ার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে জলে গুলে তা গরম তেলে ছেড়ে দিলেই ফুলে ওঠে। এর জন্য একে বলে তেল পিঠা বা তেলের পিঠা।

ভাপা পিঠা : চালের গুঁড়া মেখে তাতে নারকেলের ও গুড়ের কুঁচি দিয়ে ছোট বাটির ছাঁচে ভরে ভাপ দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয়, তার নাম ভাপা পিঠা। এই পিঠা সবার কাছেই খুব প্রিয়। পশ্চিমবঙের জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি জেলায় এই ভাপা পিঠা বেশ জনপ্রিয়। উওরবঙ্গের গ্রাম থেকে শহরের অলিগলিতে, ফুটপাত থেকে ফাস্ট ফুডের দোকানে সবখানেই এই পিঠা পাওয়া যায়।

নকশি পিঠা : এ পিঠার গায়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকা হয় কিংবা ছাঁচে ফেলে পিঠাকে নানা রকম নকশার আদলে তৈরি করা হয় বলেই এই পিঠার নাম নকশি পিঠা। সব পিঠায় নকশা তোলা হয় না। সাধারণত পুলি পিঠা ও তেল পিঠা নকশি করা হয়। চালের গুঁড়ার 'কাই' কে বেলনা দিয়ে বেলে প্রথমে পুরু রুটি তৈরি করে পরে তার উপর খেজুর কাঁটা, পাটকাঠি ও সূচ দিয়ে নকশি আঁকা হয়। আঁকার কাজ শেষ হলে বাঁশের ছিলকা বা মুছনা দিয়ে নকশার বাইরের অংশ ছেঁটে ফেলা হয়। বলাবাহুল্য, এখানে রংতুলির প্রশ্ন আসে না। সূচ, কাঁটা বা কাঠি দ্বারা রুটির গায়ে দাগ কেটে নকশা তোলা হয়। ফুল, পাতা, মাছ, পাখি, গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জাম ও জ্যামিতিক রেখা পিঠার নকশায় তোলা হয়। পিঠার আকৃতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যথা – কাজললতা, শঙ্খলতা, হিজলপাতা, সজনে পাতা, চিরলপাতা, উড়িফুল, কন্যা মুখ, সরপুস, সাগর দীঘি, জামাই মুচড়া, সতীন মুচড়া, বেটফুল ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমী লোক শিল্প সংগ্রহে মাটির তৈরি কৃত্রিম নকশি পিঠা রক্ষিত আছে। এসব পিঠার গঠনে এক পিঠে রূপে ও রেখায় বাস্তব প্রতিকৃতিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে অর্থাৎ পাতাগুলি আকারে বিভিন্ন পাতার মত, মাছগুলি আকারে ভিন্ন ভিন্ন মাছের মত, পাখিগুলি আকারে এক একটি পাখির মত করে গড়া হয়েছে। কোন কোনটিতে বাস্তব আকৃতি ধরা পড়েছে, যেমন – পানপাতা, পাটপাতা, চাঁদামাছ, ভ্রমর, চড়ুই প্রভৃতি। গোল বৃত্তের সুচিত্রিত জ্যামিতিক নকশাগুলি বেশ মনোরম। পদ্মচাকা, কলাচাকা প্রভৃতি নকশার মধ্যে ছন্দ জ্ঞানের পরিচয় আছে। আবার কন্যা মুখ, জামাই মুখ, সতীন মুচড়া, জামাই মুচড়া প্রভৃতি নামের পিঠা মানবাকৃতির কোন নকশা নয়, বিভিন্ন কারুময় জ্যামিতিক নকশারই ভাবাত্মক নাম। পাকুয়ান বা তেলের পিঠা ছাড়াও পুলি পিঠাতেও নকশা আঁকা হয়। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, এরূপ পিঠার আকার পানিফলের ও স্বস্তিকার মত। চন্দ্রের আকৃতি বিশিষ্ট চন্দ্রপুলি পিঠা তৈরির কথা কাজলরেখার গীতিকায় পাওয়া যায়। এই নকশি পিঠা গ্রামবাংলার রাঢ় অঞ্চলগুলিতে মূলত বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। কাঁথার মতো পিঠার নকশাও একান্তভাবে বাঙালি নারী মানসের ফসল। সে সৃষ্টির আয়ু ক্ষণিক মাত্র ভোজ্য দ্রব্য হিসেবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যা রসনাতৃপ্ত করে, তাতেই মনের রুপটুকুকে ফুটিয়ে তুলে গ্রামবাংলার নারীরা নান্দনিকতা, সৌন্দর্যবোধ ও স্বভাবজ সুচার বৃত্তির পরিচয় দিয়েছে।

মেড়া পিঠা : এই পিঠাটি যেমন সহজে বানানো যায়, তেমনি ফ্রিজে ইচ্ছেমতো রেখে খাওয়া যায়। কোথাও আবার একে সেদ্ধ পিঠাও বলে। এই পিঠা পচ্ছন্দমত টুকরো করে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, ডিম দিয়ে ভেজে খাওয়া যায়।

সাইন্না পিঠা : এটি বাংলাদেশের নোয়াখালী অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় পিঠা। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এখনো এই পিঠা তৈরি হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে ছাইয়া পিঠাও বলে। এটি বানাতে প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়া, নারকেল, খেজুরের গুড় আর তেজপাতা। ভাপে সেদ্ধ করে এ পিঠা বানাতে হয়। আর ঠান্ডা করে খেলে অর্থাৎ রাতে বানিয়ে শীতের সকালে খেলে এ পিঠা অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। নোয়াখালী অঞ্চলে সাইন্না পিঠা নিয়ে মজার লোকছড়া আছে। ছড়াটি হল –

"সাইন্না হিডা শীতকালে
মা বানাই দিছে
দুলাভাইরা আংগো বাড়ি
বুবুরে লই আছে।
গেরামগঞ্জে সাইন্না হিডা
বাড়ি বাড়ি যায়,
তালতো বইন পিড়াত বই
মজা করি খায়।"[৮]

রস পাকান : এ পিঠা তৈরি হয় শুকনো সুজি, ডিম আর চিনি দিয়ে। এই পিঠার স্বাদ সেই কারণে খুব মিষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এই রস পাকান খুব জনপ্রিয় একটি পিঠা।

কুলি পিঠা : সারা বাংলায় কুলি পিঠা অন্যান্য পিঠার মতোই বেশ জনপ্রিয়। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর অঞ্চলে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই কুলি পিঠা বিশেষভাবে প্রচলিত। এ পিঠা বানাতে প্রয়োজন হয় শুকনো চালের গুঁড়া, দুধ ও নারকেল। এ পিঠা দেখতে খুবই সুন্দর।

মালপোয়া, ঝিকিমিকি ও ফুল পিঠা : মালপোয়া আর ঝিকিমিকি পিঠা বানানো হয় ময়দা, শুকনো চালের গুঁড়া ও চিনি দিয়ে। দুটোই মজাদার পিঠা। পশ্চিমবঙের বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় ঝিকিমিকি, মালপোয়া খুব বিখ্যাত এবং এর স্বাদ অতুলনীয়। আর ফুল পিঠা অনেকটা নকশি পিঠার মত দেখতে কিন্তু নকশি পিঠার চেয়ে কিছুটা নরম হয় এই পিঠা। গ্রাম বাংলায় এখনও এই পিঠার প্রচলন রয়েছে।

তাই বলা যায়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পিঠা বাংলার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। একেক অঞ্চলের পিঠা তৈরির পদ্ধতি, উপাদান এবং পরিবেশন সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরে।

এই ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলি প্রস্তুত ও বিভিন্ন পিঠার বিভিন্ন রূপ দেওয়ার একমাত্র কারিগর হলেন বাড়ির মহিলারা অর্থাৎ মা – ঠাকুমারা। যুগ যুগ ধরে তারা নিজেদের দক্ষ হাতে পিঠা তৈরি করে আসছেন। বলা যায়, তারাই পিঠাপুলি তৈরির ধারক ও বাহক। এই পিঠাপুলি তৈরি তাদের কাছে কেবল কোনো কাজ নয়, এটির সাথে জড়িত আছে তাদের আবেগ। অতি যত্নে, নিপুণ হাতে তারা প্রতিটি পিঠা তৈরি করে। বিভিন্ন পিঠায় হাতের আঙ্গুলের কারুকার্যে, নখের আঁচড়, সাচের ব্যবহার করে পিঠাকে এক অপূর্ব শৈল্পিক রূপ দেয়, যেমন – নকশি পিঠা, পুলি পিঠা। যা বাংলার নান্দনিক সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এছাড়াও বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি নারীর তৈরি করা সুস্বাদু পিঠা তার যত্নশীলতা, দক্ষতা এবং পারিবারিক ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পিঠা তৈরির পর তা পরিবারের প্রতিটি সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাড়িতে বিতরণ করার একটি রীতি রয়েছে। আসলে কথায় আছে, ভাগ করে কোনো কিছু খেলে, সেই জিনিস আরো বেড়ে যায় সাথে তার আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই বলা যায়, পিঠা কেবল কোনো খাদ্য নয়, পিঠা হল আদান-প্রদান, পারিবারিক বন্ধন, সম্পর্কের উষ্ণতা, বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনে সংহতি বজায় ও মজবুত রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আধুনিক জীবন যেখানে কঠোর, কাজের চাপ ও ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ সেখানে পিঠা তৈরি আমাদের ঐতিহ্যবাহী সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ ঐতিহ্যের পূনঃ জাগরণ ঘটায়। এটি একটি সাংস্কৃতিক আচার হিসেবে কাজ করে। পিঠার গন্ধ ও স্বাদ বছরের পর বছর ধরে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে সেই পুরনো গভীর স্মৃতি নস্টালজিয়া এবং তীব্র আবেগ তৈরি করে।

একসময় এই পিঠা শুধুমাত্র গ্রামীণ নবান্ন উৎসব ও পৌষ পার্বণে তৈরি করা হয়, এখন তা সারাবছর পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক পুঁজির প্রভাবে পিঠা এখন আর কেবল বাড়িতে তৈরি হয় না, এটি ফুটপাত, রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হয়। এটি এখন শহুরে মানুষদের কাছে 'নস্টালজিয়ক পণ্য' হয়ে গেছে। বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পিঠা অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেশ-বিদেশে। যার ফলে পিঠা প্রস্তুতকারক নারীদের শ্রমকে আর্থিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যা নারীদের জীবিকার একটি পথ তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, এই আধুনিকতার যুগে ঐতিহ্যবাহী পিঠাকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়তে হয়েছে। আধুনিক 'ফাস্ট ফুড' খাবারের সাথে শ্রমসাধ্য পিঠার এক প্রতীকি লড়াই দেখা দিয়েছে। তারফলে পিঠা এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যতই সমাজে আধুনিকতার চাপ ও আগ্রাসন ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে বাঁধা দেয়, ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলি ততই মানুষকে একত্রিত করে তাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। পিঠার এই সংগ্রাম নীরব কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্যদিকে পিঠা আমাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও আধুনিক সমাজের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করে। এই সময় দাঁড়িয়েও বাংলার গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে বেশকিছু বাড়িতে পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখে পিঠা প্রস্তুত করা হয়। আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা এবং ব্যস্ততার মধ্যেও পিঠার এই আয়োজন আমাদের মানবিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচার – অনুষ্ঠান মনে করিয়ে দেয়। এই প্রাচীন সংস্কৃতি সমাজে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, আজও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে পিঠাপুলি, পায়েস নিয়ে অসংখ্য গান, কবিতা ও ছড়া প্রচলিত রয়েছে।

পিঠাকে নিয়ে বিখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল তার 'পল্লী মায়ের কোল' কবিতায় লিখেছেন, -

"পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসি খুশিতে বিষম খেয়ে,
আরও উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।"[৯]

এই কবিতায় পিঠার সাথে জড়িয়ে থাকা আনন্দ ও উল্লাসের এক নিখুঁত চিত্র ফুটে ওঠে।

পিঠার আয়োজন হল বছরের সেইসময়, যখন সমাজ সচেতনভাবে তার নিজের দিকে ফিরে তাকায় এবং আগুন ও উষ্ণতার চারপাশে পুনরায় সংহত হয়। এই ক্ষুদ্র খাদ্যবস্তুটির মাধ্যমে একটি জাতি তার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশার বার্তা বহন করে। পিঠা এভাবে খাদ্য – সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলার মানবিকতা, পরিচয় এবং সংহতিকে রক্ষা করে চলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার পিঠার ঐতিহ্য অনেক পুরনো। পিঠা হল বাংলার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার যে কোনো উৎসবে আনন্দে মিশে আছে রকমারি পিঠা। ধারনা করা হয়, প্রাচীন কাল থেকে এই পিঠা সংস্কৃতির উৎপত্তি, আর এখনো সেই সংস্কৃতি বহাল আছে। নানারকম বিদেশি খাবারের প্রাচুর্যের কারণে শহরের নাগরিকরা অনেকেই অনেক পিঠা না চিনলেও না খেলেও পিঠার এই ঐতিহ্য টিকে আছে এবং শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম থেকে আসা শহরে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলো শহরের পথের মোড়ে মোড়ে, শহরের মেলায়, উৎসবে উনুন জ্বালিয়ে চালের গুঁড়া ও খেজুরের রস দিয়ে পিঠা তৈরি করে শহরবাসীদের পিঠার স্বাদ নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, প্রসার ঘটাচ্ছে আমাদের পিঠা সংস্কৃতির। তাই পিঠা কেবল পেট ভরায় না, এটি আমাদের শেখড়, শৈশব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে মিশে থাকা ভালোবাসার গল্প।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 92
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 737 - 744
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. ওঝা, কৃত্তিবাস, শ্রীরাম পাঁচালী, আদি কান্ড, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, শ্রীরামপুর – ৭১২২০১, ১৮০২, পৃ. ১৪
২. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ, শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম. এ কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- ৭০০০০৯, ২০১৯, পৃ. ১৮
৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চন্ডীমঙ্গল, বণিক খন্ড, রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায়, কলিকাতা – ৭০০০০৯, ১৮২৩, পৃ. ২০
৪. কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ দাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী, নিউ দিল্লী – ১১০০০১, ১৯৬৩, পৃ. ৩০
৫. রায় গুণাকর, ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল , রত্নাবলী, কলকাতা -৭০০০০৯, ১৯৯৮, পৃ. ১৪২
৬. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুমার ঝুলি, কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালার গল্প, ভট্টাচার্য অ্যান্ড সান, কলিকাতা – ৭০০০০৯, ১৯০৭, পৃ. ৯৭
৭. গুপ্ত, ঈশ্বর, পৌষ পার্বণ ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), কলিকাতা – ৭০০০০৯, ১৮৮৫, পৃ. ৫
৮. আহমেদ, ডক্টর ওয়াকিল, বাংলার লোক – সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা -২, ১৯৬৫, পৃ. ৪০-৬১
৯. কামাল, বেগম সুফিয়া, পল্লী মায়ের কোল (কবিতা), সাঁঝের মায়া (কাব্যগ্রন্থ),সময় প্রকাশন, ঢাকা -২, ১৯৩৮, পৃ. ১৩